#আমি পদ্মজা পর্ব ৬৮

_____

পদ্মজার শরীর ঘামে ভিজে একাকার। প্রচণ্ড গরম লাগছে। সকালে খুব ঠান্ডা ছিল। সোয়েটার পরার পরও তার শরীর কাঁপছিল। তাই আমির পদ্মজার গায়ে শাল পেঁচিয়ে দিয়েছিল। তারপর তো আমির বেরিয়েই গেল। এখন পদ্মজা গরমে ঘামছে। সময়টা দুপুরবেলা। সূর্য আজ অনেক তেজ নিয়ে আকাশে উঠেছে। পদ্মজার হাসঁফাঁস লাগছে। গরমে মাথা ব্যথা হয়ে গেছে। বসে থাকতে থাকতে কোমরও যেন অবশ হয়ে গেছে। আশেপাশে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভোরের দিকে মেয়েদের চিৎকার কানে এসেছিল। পদ্মজার কিছু করার ছিল না। সে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। খট করে দরজা খুলে যায়। পদ্মজা চোখ তুলে তাকালো। আমির এসেছে!

পরনে ফুলহাতা সাদা গেঞ্জি। পদ্মজা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আমির পদ্মজার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তারপর শাল সরাতে চাইলে,পদ্মজা বাঁধা দিয়ে বললো,' আমি পারবো।'
আমির সরে দাঁড়ালো। পদ্মজা গা থেকে শাল বিছানায় রেখে সোয়েটার খুললো। তারপর কাঠ কাঠ গলায় বললো,'দয়া করে আমাকে আর বাঁধবেন না।'
'নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার স্বভাব আমার নেই।'
'বসে থাকতে,থাকতে আমার কোমরের হাড় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।'
'দুই-তিনদিন বসে থাকলে হাড় ক্ষয় হয় না।'
পদ্মজা হতাশ হয়ে বললো,"আমার যন্ত্রণা হয়। ঝিমঝিম করে পা।'
আমির ঘরের এক কোণে থাকা কাঠের বক্সের

দিকে এগোতে এগোতে বললো,’মামার বাড়িতে আসোনি যে,যেভাবে চাইবে সেভাবেই হবে।’
‘একুশটা মেয়ে কি জোগাড় হয়ে গেছে?’
আচমকা পদ্মজার এমন প্রশ্ন,তাও শান্ত কণ্ঠ। আমির বক্সের তালা খুলে একটা ছুরি বের করলো। পদ্মজার জবাব দিল স্বাভাবিককণ্ঠে,’এতো সহজ নাকি! এতসব রিদওয়ান কেন যে তোমাকে বললো!’
‘আপনি আমার মাকে কীভাবে মারতে চেয়েছিলেন?’
‘পথের কাঁটা রাখতে নেই।’

পদ্মজা চমকে গেল,আহত হলো। আমির কত সহজভাবে তার মাকে উদ্দেশ্য করে বললো ‘পথের কাঁটা রাখতে নেই।’ পদ্মজা কথা বলার মতো আর মন পাচ্ছে না। কষ্টও যেন সয়ে গেছে। শুধু তীক্ষ্ণ চোখে আমিরের পিঠের উপর তাকিয়ে রইলো। আমির উঁবু হয়ে কী যেন

খুঁজছে। দরজা খোলা। পদ্মজা পরিকল্পনা করলো,সে এখন এক দৌড়ে ধ রক্তে চলে যাবে। যে ভাবনা সেই কাজ, এক পা এক পা করে পিছিয়ে যায়। আমির না দেখেই পদ্মজার উদ্দেশ্যে বললো,' পালাতে পারবে না।'
পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। বললো,'পালাচ্ছি না।'
আমির উঠে দাঁড়াল। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বললো,'তো কোথায় যাচ্ছো?'
পদ্মজা বিছানায় এসে বসলো। তার মাথা কোনো কাজই করছে না। এখানে কোনো পথই নেই। সব পথ যেন বন্ধ করা। সে ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বললো,' আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করছি না। করবও না। আমাকে বাঁধবেন না অনুরোধ।'
'ছলনার পথ নিতে চাইছো?'
'ছলনা করবো কেন? টয়লেটে যেতে পারি না,শুতে পারি না। স্বামীর নতুন বাড়িতে এসেছি

তো নাকি? একটু শাস্তি তো দিবেন।’
‘অভিনয়ে খুব কাঁচা তুমি। হচ্ছে না। ভালো করে অভিনয় করো নয়তো যা বলার সোজাসুজি বলো।’

পদ্মজা থতমত খেয়ে গেল। সে সোজাসুজি আর কিছুই বললো না। এক রাত চলে গেছে। মানে আর সাতদিন বাকি। কিছু করতে পারবে তো! আমির বক্স থেকে একটা বস্তু হাতে নিল। পদ্মজার দিকে ফিরে বললো,’যদি এটা ধরতে পারো তোমার বসা,শোয়া সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।’
কথা শেষ করেই বস্তুটি পদ্মজার দিকে ছুঁড়ে মারলো। পদ্মজা ধরে ফেললো। আমির আবার বক্সের দিকে ফিরলো। বললো,’দারুণ। আমি আমার কথা রাখবো।’

পদ্মজা বস্তুটির এক মাথা ধরে টান দিতেই একটা ছুরি বেরিয়ে আসে। সে অবাক হয়ে

আমিরের দিকে তাকালো। আমির মনোযোগ দিয়ে কি যেন খুঁজেই চলেছে। পদ্মজা তাৎক্ষণিক ভাবলো,ছুরি দিয়ে সে আমিরকে ভয় দেখাবে। ভয় দেখিয়ে সবগুলো মেয়েকে বাঁচিয়ে ফেলবে। তার উত্তেজিত মস্তিষ্ক গভীরভাবে কিছু আর ভাবলো না। পরিস্থিতিকে পানির মতো সহজ ভেবে,সে ধীরে,ধীরে এগিয়ে গেল। আমির আড়চোখে খেয়াল করলো, পদ্মজা আসছে। আর তার হাতে ছুরি। তাও আমির নড়লো না। ওইভাবেই রইলো। আমির যখন একটু দূরে তখন পদ্মজা হাঁটা থামিয়ে দৌড়ে এসে আমিরের গলায় ছুরি ধরে বললো,'সবগুলো মেয়েকে ছেড়ে দিন নয়তো আমি আপনাকে মেরে ফেলবো।'
আমির হাসলো। বললো,'পদ্মজা,এখানে শুটিং হচ্ছে না।'
পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে আছে। তবুও সে ভাঙা গলায় হুংকার ছেড়ে বললো,' যা বলছি করুন।'

আমির নাছোড়বান্দা স্বরে বললো,’করব না।’
পদ্মজার আশার পাহাড় দুই ভাগ হয়ে যায়।
তবুও সে হার মানার মেয়ে নয়।
বললো,’আমাকে সহজ ভাববেন না। আমি
কিন্তু স্বামী বলে ছেড়ে দেব না।’
‘এতো লম্বা হয়ে লাভ কী হলো? স্বামীর গলায়
ছুরি ধরতে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিতে
হচ্ছে তোমার। এবার পায়ের পাতা মাটিতে
ফেলো নয়তো আঙুল ভেঙে যাবে।’
পদ্মজা দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে
বললো,’গতকাল থেকে আপনি আমার সাথে
মশকরা করে যাচ্ছেন।’
আমির চমৎকার কৌশলে তার জায়গায়
পদ্মজাকে নিয়ে আসে আর পদ্মজার জায়গায়
সে চলে আসে। শুধু ছুরিটা আলাদা। আমির
বললো,’তোমার হাতের ছুরি দিয়ে সুতাও কাটা
যাবে না। ভোঁতা ছুরি। খেয়াল না করেই
আমাকে আক্রমণ করতে চলে এসেছো।

মশকরা আমি করছি নাকি তুমি? বাচ্চাদের মতো আচরণ করছো। বুদ্ধি হাঁটুতে চলে এসেছে। গতকালের শফিকের মৃত্যুটা তোমাকে তোমার জায়গা থেকে নড়বড়ে করে দিল, সেখানে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছো! বোকা মেয়ে। এখন আমি যদি তোমার গলার শিরাটা কেটে ফেলি? আমার হাতের ছুরি কিন্তু ভোঁতা না।'

পদ্মজার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। আমির এমনভাবে চেপে ধরে ছুরি ধরেছে যে, মনে হচ্ছে এখুনি আমির তার প্রাণ নিয়ে নিবে। কিন্তু আমির সেটা করলো না। পদ্মজাকে আলগা করে দিল। পদ্মজা ছাড়া পেয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। আমির বললো,'আগে ঘোর কাটিয়ে নিজের অবস্থানে ফিরে আসো।'
কথা শেষ করে যখনই আমির বের হবে তখন

পদ্মজা প্রশ্ন করলো,'এতো মন্দ ভাগ্য কেন হলো আমার?'

আমির জবাব না দিয়েই চলে গেল। পদ্মজা মেঝেতে বসে,ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে কোনদিকে যাবে,কী করবে? দিকদিশা পাচ্ছে না। এতো ভেবেও কোনো কূলকিনারা পেল না। আমির যদি তাকে বেঁধে না যায় তবে সে কিছু করার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেটা কখনোই হবে না। আমির বোকা না। সে খুব সতর্ক এবং চালাক। পদ্মজা কান্না করা ছাড়া করার মতো আর কিছু পাচ্ছে না। নিজের কপাল চাপড়ে শুধু কান্না করারই সুযোগ আছে এখানে। আমির হ্যান্ডকাপ নিয়ে আসলো। পদ্মজার হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল। পদ্মজা কিছু বললো না,আমিরও বললো না। হ্যান্ডকাপ পরিয়ে আমির তার মতো চলে গেল। বের হওয়ার পূর্বে আরভিদকে বললো,'পদ্মজার

হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো আছে। যদি এখানে হাঁটাহাটি করে কিছু বলো না। আমি বড় দরজায় নতুন তালা দিয়েছি। চাবি একটা আর সেটা আমার কাছে। যা ই করুক,বের হতে পারবে না।'
আরভিদ বললো,'যদি আমাকে আক্রমণ করে?'
'ও হাত ছাড়া কাউকে আক্রমণও করতে পারে না। তাই নির্ভয়ে থাকবে। যা ইচ্ছে করুক পাত্তা দিবে না। মনে করবে,পিঁপড়া ঘোরাঘুরি করছে।'
আরভিদ বললো,'জি,স্যার।'
'মেয়েগুলোকে খাবার দিবে। আমার আসতে অনেক রাত হবে।'
'জি,স্যার।'
আমির রাফেদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।
যাওয়ার পূর্বে ভালো করে সবকিছু দেখে নিলো।

পদ্মজা দ্বারা তার ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো পথ আছে নাকি! নেই! আমির নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। আচমকা তার খেয়াল হলো,তার হাত বন্দি কিন্তু পা বন্দি না। দরজাও খোলা। সে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে আসলো বাইরে। চারিদিক নির্জন,থমথমে। সে আগে প্রতিটি ঘর দেখলো। এটুতে(A2) রিদওয়ান ঘুমাচ্ছে। বাকি ঘরগুলো খালি। সে পা টিপে,টিপে স্বাগতম দরজা পেরিয়ে ধ-রক্ত দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ধ-রক্তের মানে সে মনে মনে ভেবে নিয়েছে,ধর্ষণ এবং ধ্বংস থেকে নেয়া ধ। রক্তটা বোধহয় এদের মনের আনন্দ। তাই নামকরণ হয়েছে,ধ-রক্ত। পদ্মজা দরজা ধাক্কা দিতেই আরভিদ সামনে এসে দাঁড়ালো।

_____
মৃদুল সাইকেল নিয়ে বড় সড়কে পূর্ণার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা রায়পুর মেলায় যাবে। আজ শেষ দিন। পূর্ণার নাকি অনেকদিনের ইচ্ছে রায়পুর মেলায় যাওয়ার। কিন্তু হেমলতা কখনো মেলায় যেতে দেননি। তিনি সবসময় ভীড় থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছেন। পূর্ণা তার বন্ধুদের কাছে শুধু শুনেছেই কখনো যায়নি। কথায় কথায় যখন মৃদুলকে সে বললো তার ইচ্ছের কথা। মৃদুল তাৎক্ষণিক পূর্ণাকে জানালো,'আমি তোমারে নিয়া যামু। কাইল দুপুরে বড় সড়কে আইসা পড়বা। বোরকা পইরা আসবা। '
মৃদুল অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠে। তখন দূরের ক্ষেতে দেখা যায় পূর্ণাকে। কালো বোরকা পরা। আপাদমস্তক ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা। মাথার উপর তুলে রেখেছে নিকাব। সড়কের দুই পাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত। ক্ষেতের

আইল ধরে ছুটে আসছে পূর্ণা। ওড়নার আংশিক অংশ বাতাসে উড়ছে। মৃদুল মনোমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণা মৃদুলের কাছে এসে হাঁপাতে থাকলো। হাঁপাতে,হাঁপাতে বললো,'অনেক দেরি হয়ে গেছে তাই না? বড় আম্মা আসতেই দিচ্ছিল না।'
মৃদুল পূর্ণার পাতলা ত্বকের মুখশ্রীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললো,'কী বইলা আইছো?'
'কিছুই না। বলেছিলাম,সুরুজ চাচার বাড়িতে যাব। তখন বললো,কোথাও যাওয়া-যাওয়ি নাই। আপা জানতে পারলে নাকি বড় আম্মার উপর রাগবে। তাই না বলেই চলে এসেছি।'
'চিন্তা করব তো।'
'না বলে কতবার বের হয়েছি। কিছু হবে না।'
মৃদুল তাড়া দিয়ে বললো,'তাইলে তো হইলোই। তাড়াতাড়ি উঠো। যাইতে সময় লাগব।'
পূর্ণা এতক্ষণে সাইকেল খেয়াল করলো। সে

বললো,’ সাইকেলে করে যাব?’
মৃদুল ফিরে তাকাল। বললো,’তাইলে কী দিয়া যাইবা? হাঁইটা গেলে বাড়ি আইতে আইতে আজকে সারা রাইত লাগব।’

মৃদুলের পিছনে থাকা খালি জায়গাটায় পূর্ণা তাকাল। মৃদুলের খুব কাছে। আর এখানে বসলে মৃদুলের পেট জড়িয়ে ধরতে হবে। ভাবতেই পূর্ণার হাড় হিম হয়ে আসে। এতদিনের পরিচয়ে একজন আরেকজনের হাতও ধরেনি। আর আজ এতো কাছে বসে পেট জড়িয়ে ধরতে হবে! পূর্ণা ঢোক গিলে মিনমিনিয়ে বললো,’সাইকেল দিয়ে যাব না আমি।’

মৃদুলের ভ্রুযুগল বেঁকে যায়। সে ধমকে উঠে,’নাটক করতাছো কেন? তাড়াতাড়ি উঠো। আর মুখটা ঘুরো। মানুষ দেখব।’

সূর্যের কিরণ এসে পড়ে মৃদুলের চোখেমুখে। স্নিগ্ধ, চকচকে ফর্সা মুখের সাথে বেঁকে যাওয়া দুটি ভ্রু কী সুন্দর করেই না মানিয়েছে! পূর্ণা সেদিকে চেয়ে থেকে কিছু বলতে পারলো না। নিকাব দিয়ে মুখ ঢেকে মৃদুলের পিছনে বসলো। মৃদুল মৃদু হাসলো, যা চোখে পড়লো না পূর্ণার। মৃদুল সাইকেলের চাকায় পা দিতেই পূর্ণা খামচে ধরে মৃদুলের শার্ট। মৃদুলের সর্বাঙ্গে একটা অজানা,অচেনা সুন্দর অনুভূতির উথালপাতাল ঢেউ উঠে। পূর্ণার বুকে দ্রিম দ্রিম শব্দ হচ্ছে! নিঃশ্বাস এত বেশি এলোমেলো হয়ে পড়ে যে,পূর্ণার মনে হচ্ছে এখুনি সে মারা যাবে। মৃদুল আটপাড়া পার হয়ে, পূর্ণার উদ্দেশ্যে বললো,'কাঁপতাছো কেন?'
পূর্ণা কিছু বলতে পারলো না। কী লজ্জা! সে কাঁপছে সেটাও মৃদুল টের পাচ্ছে। পথের দুই দিকে যতদূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ মাঠ। কোথাও কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। পূর্ণা দূরে চোখ

রেখে চুপ করে রয়েছে। মৃদুল বললো,’পূর্ণা?’
এ কেমন মায়াময় ডাক! পূর্ণার হৃদয়ে উঠা অপ্রতিরোধ্য তুফান বেড়ে যায়। বুকে এতো জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে কেন? যদি মৃদুল শুনে ফেলে! সে তো লজ্জায় মরেই যাবে। মৃদুল আবার ডাকলো,’পূর্ণা?’
পূর্ণা জুবুথুবু হয়ে উত্তর দিল,’কী?’
‘আমার হাত পা অবশ হইয়া যাইতাছে কেন?’
‘আমারও।’
সাইকেল থেমে গেল। মৃদুল পূর্ণাকে বললো,’নামো।’
পূর্ণা নামলো। মৃদুল বললো,’সাইকেল দিয়া আর যাওয়া যাইবো না। দূরে থাকা ভালা। তোমার ছোঁয়া বিজলির মতোন বাইরিতাছে আমারে।’
মৃদুলের কথা শুনে পূর্ণার খুব হাসি পেলো। সে হাসি আটকে রাখলো না। হেসে ফেললো।

যদিও হাসি দেখা যায়নি। তবে মৃদুল বুঝতে পারলো,পূর্ণা হেসেছে। সে মুখ ভার করে বললো,'হাসো,হাসো। হাসবাই তো। আরেকটু হলে মরেই যেতাম।'
পূর্ণা সশব্দে হেসে উঠলো। মৃদুল বললো,' হইছে আর হাসা লাগব না। হাঁটো। মাঠের মাঝখান দিয়া যাই কী বলো? তাইলে তাড়াতাড়ি যেতে পারব।'
পূর্ণা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। বললো,'সাইকেল কী করবেন?'
'হাত দিয়া ঠেলে নিয়া যাব।'
দুজন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রায়পুর চলে আসে। মেলায় ঢুকতেই আছরের আযান পড়ে যায়! পূর্ণার মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে ভীত কণ্ঠে বললো,'আছরের আযান পড়ে গেছে। বাড়ি কখন যাব? একটু পর তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আসুন,চলে যাই।'

‘মাত্র তো আইলাম। কিছু কিইনা এরপর যামুনে।’
‘দেরি হয়ে যাবে।’
‘খালি চুড়ি আর লিপস্টিক হইলেও নিয়া যাবা। আসো।’

মৃদুল শক্ত করে পূর্ণার হাত ধরলো। এই প্রথম মৃদুল হাত ধরেছে! সঙ্গে,সঙ্গে পূর্ণার মনে হয়,চারিদিকের সব ভীড়,কোলাহল থমকে গেছে। থমকে গেছে নাগরদোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ! পূর্ণার মনের আঙিনা জুড়ে নৃত্য শুরু হয়। সে ভুলে যায়, তার বাড়ি ফেরার তাড়া! মৃদুল যেদিকে নিয়ে যায়,সেদিকে ছুটে যায়। চারিদিকে কত শব্দ,কত মানুষ,রঙ-বেরঙের কত শাড়ি,গহনা,চুড়ি। কিছুই পূর্ণার চোখে পড়ছে না। শুধু অনুভব করছে,একটা পুরুষালি শক্ত হাত তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মনে মনে এই মানুষটাকে সে ভালোবাসে!

রঙিন,রঙিন স্বপ্ন দেখে। এই সমাজ বিয়ের বাজারে সাদা-কালোর ভেদাভেদ করবে জেনেও সে ভালোবাসে। গায়ের রঙ মেনে কী আর ভালোবাসা হয়! মৃদুল একটা চুড়ির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আট ডজন চুড়ি কিনলো। পূর্ণা মানা করেছে,মৃদুল শুনেনি। চুড়ি কেনার পর মৃদুল বললো,' অন্যকিছু দেখো। নূপুর নিবা না?'

পূর্ণা মাথা নাড়াল। সে নূপুর নিবে। সে একটা,একটা করে নূপুর দেখা শুরু করলো। মৃদুল এক ডজন সুতার চুড়ি হাতে নিল। চুড়িগুলো নিজের চোখের সামনে ধরলো। চুড়ির গোল ফাঁকা অংশে পূর্ণার মুখটা ভেসে উঠে। নিকাব মাথার উপর তুলে রাখা। চিকন নাকে নাকফুলটা জ্বলজ্বল করছে। পূর্ণা একজোড়া নূপুর হাতে নিয়ে মৃদুলের দিকে তাকালো। মৃদুল দ্রুত চুড়ি সরিয়ে নিল।

অন্যদিকে তাকালো। পূর্ণার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে।
কথা ছিল শুধু চুড়ি,লিপস্টিক কিনে চলে যাবে অথচ মৃদুল পারলে পূর্ণার জন্য পুরো মেলাটাই কিনে ফেলে। পূর্ণা মৃদুলের পাগলামি দেখে অবাকের চরম পর্যায়ে। এতকিছু নিচ্ছে! সব জিনিস রাখার জন্য বড় ব্যাগও কিনেছে! পূর্ণা মৃদুলকে চাপা স্বরে প্রশ্ন করলো,'এত কিছু কেন নিচ্ছেন?'
মৃদুল বললো,'জীবনে প্রথম আম্মার জন্য শাড়ি,জুতা কিনছিলাম। আজ যখন আবার সুযোগ পাইছি মেয়ে মানুষের জন্য কেনাকাটা করার,কিনতে দেও।'

সন্ধ্যার আযান কানে আসতেই পূর্ণার গলা শুকিয়ে যায়। সে খপ করে মৃদুলের হাতের বাহু খামচে ধরে, কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,'আমার আর কিছু লাগবে না। জীবনে আর মেলায়ও

আসব না। বাড়ি নিয়ে চলুন।’
‘কাঁদতাছো কেন? আইচ্ছা আর কিছু কিনব না। বাজারে যাই। এরপরে বাড়িত যামু।’

মেলায় প্রবেশ করার পূর্বে,রায়পুরের বাজারের এক দোকানে মৃদুল তার সাইকেলটা রেখে এসেছে। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। দোকানদার মজিদ হাওলাদারের নাম শুনে,মৃদুলকে বাসায় যেতে বলেছিল। মৃদুল বলেছে,আরেকদিন যাবে। তারা মেলা থেকে বের হতে প্রস্তুত হয় তখন একজন লোক মৃদুলের পিঠ চাপড়ে বললো,’মৃদুল না?’
মৃদুল পরিচিত কারো কণ্ঠ পেয়ে উৎসুক হয়ে ফিরে তাকালো। লোকটিকে দেখে চিনতে পারলো। বললো,’আরে গফুর ভাই। কেমন আছেন?’
‘এইতো ভালাই আছি।’
‘রায়পুরে কী? মেলায় আইছেন?’

‘ছোট বইনডার জামাইর বাড়ি এইহানে। তোমার সাথে কেলা এইডে? বউ নাকি? বিয়া করলা কবে?’
পূর্ণা আড়ষ্ট হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুল আড়চোখে পূর্ণাকে দেখলো। তারপর বললো ‘জি ভাই,বউ। মাস খানেক হইলো।’

তখনই পূর্ণা মৃদুলের পিঠে চিমটি কাটলো। মৃদুল ‘আউ’ করে উঠে। গফুর উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তাই সে জোরপূর্বক হেসে বললো,’আজকে অনেক শীত! শীতে চিমটি মারে! আইচ্ছা,ভাই আজ আসি।’
‘রায়পুর কার বাড়িত আইছো কইলা না তো?’
‘অলন্দপুরে আইছি,ফুফুর বাড়িত। এহন যাই ভাই।’
‘মজিদ হাওলাদার তোমার ফুফুর ভাসুর না?’
‘জি।’
‘মানুষটারে দেখার অনেক ইচ্ছা আছিলো।

অনেক ভালা কথা হুনি।’
মৃদুলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললো,’চইলা আইয়েন। আমিতো আছিই। আমারে এখন যাইতে দেন।’
‘যাও মিয়া।’

মেলার বাইরে এসে পূর্ণা বললো,’বউ বললেন কেন?’
মৃদুল বললো,’তে কী কইতাম? গ্রামে তোমারে আমারে মানুষ এক লগে কথা কইতে দেখে,হাঁটতে দেখে। এতেই নিন্দা করে। এখন যদি কেউ জানে সন্ধ্যা বেলা আমার সাথে এতো দূরে মেলায় আইছো কী হইবো জানো?’
‘এইজন্য বউ বলছেন?’ পূর্ণার কণ্ঠে অভিমান টের পাওয়া গেল। মৃদুল মুচকি হাসলো। বললো,’আর কী জন্যে বলব?’
পূর্ণা কিছু বললো না। শীতে তার হাত-পা অবশ

হয়ে আসছে,এখানে অনেক বাতাস। হাঁটতে হাঁটতে মৃদুল বললো,'ভয় হইতাছে না?'
পূর্ণা অবাক হয়ে জানতে চাইলো,'কীসের ভয়?'
'পর পুরুষের সাথে রাতের বেলা এতো দূরে আছো। যদি কিছু হয়ে যায়?'
মৃদুলের কথা শুনে সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যায় পূর্ণা। সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে মৃদুলের দিকে। মৃদুল পূর্ণার তাকানো দেখে হেসে উঠলো।
পূর্ণা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমতাআমতা করে বললো,'হা...হাসছেন কেন?'
'তোমার ভয় পাওয়া দেইখা।' মৃদুল হো হো করে হাসতে থাকলো। পূর্ণার খুব রাগ হয়। সে মৃদুলকে ফেলে সামনে হাঁটতে থাকে। মৃদুল পিছনে ডাকে,'আরে খাড়াও।'

বাজারে অনেক ভীড়। চিৎকার,চেঁচামেচি। মারামারি লেগেছে বোধহয়। মৃদুল,পূর্ণা

রায়পুরের ছোট বাজারের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত ভেজাল দেখে মৃদুল পূর্ণাকে বললো,'তুমি এইখানে খাড়াও। এইদিকে কেউ নাই। আমি যাইতাছি আর আইতাছি।'
পূর্ণা চারপাশ দেখলো। ঘাটে অনেক নৌকা,ট্রলার বাঁধা। কেউ নেই,সবাই বোধহয় বাজারে। মানুষ ঝগড়া করতে আর সময় পেল না! মৃদুল চলে গেল। পূর্ণা কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দূর থেকে ইঞ্জিনের শব্দ আসছে। কোনো ট্রলার এদিকেই আসছে। গা হিম করা ঠান্ডা! পূর্ণা ব্যাগ থেকে নতুন কেনা শাল বের করে গায়ে জড়িয়ে নিল। এবার ঠান্ডা কম লাগছে!

ট্রলারের ছাদে বসে আমির সিগারেট ফুঁকছে। তার এক পা ঝুলছে। শীতের তীব্রতায় আমিরের রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তবুও উঠে

গিয়ে শীতবস্ত্র ব্যবহার করছে না। সহ্য করছে। নদীর জলে চেয়ে থেকে কিছু ভাবছে। তার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। তিন-চার দিন ধরে সারাক্ষণ কপালের রগগুলো দপদপ করছে। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করেছে। খুব ঝুঁকি নিয়ে এইবার তারা মেয়ে শিকার করছে। কখন কোন ভুল হয়ে যায় কে জানে! সারাক্ষণ একটা আতঙ্ক কাজ করে। আমির যে ট্রলারে বসে আছে,সে ট্রলারটি ঘাটে বাঁধা। তাদের আরো চারটা ট্রলারও পাশে আছে। আমিরের ডানপাশে একটা ইঞ্জিনের ছোট নৌকা এসে থামলো। নৌকায় রয়েছে মজিদ,খলিল সাথে আরো দুজন লোক। তাদেরকে দেখে আমির দ্রুত সিগারেট ফেলে দিল। ছাদ থেকে নামলো। মজিদকে ভক্তির সাথে সালাম দিল। মজিদ গম্ভীরস্বরে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন,’ এইখানে কী করছো?’
আমির বাধ্য ছেলের মতো বললো,’মেলায়

এসেছি। আম্মা পাঠিয়েছেন।’
‘তাড়াতাড়ি ফিরো।’
‘জি,আব্বা।’
মজিদের সাথে থাকা দুজন লোক মজিদের সাথে বুকে বুক মিলিয়ে বললো,’তাইলে এহন আসি ভাই?’
মজিদ বললেন,’ জি,আসুন। শুক্রবার কিন্তু আসবেন।’
‘আরে,আসব,আসব। আপনি দাওয়াত করবেন আর আমরা আসতাম না?’
মজিদ হেসে বললেন,’সাবধানে যাবেন।’

লোক দুটি চলে যেতেই আমির ছাদে উঠে বসে আরেকটা সিগারেট ধরাল। তীক্ষ্ণ চোখে মজিদের দিকে তাকিয়ে বললো,’সব চাপ কি আমার উপরেই? অন্যদের নাকে সরষে তেল দিয়ে আরাম করা হচ্ছে?’
মজিদ বললেন,’আরে আব্বা আমার! আমরাও

তো আছি।’
খলিল বাঁকা স্বরে বললেন,’সারাবছর তো আমরাই এইহানে দৌড়াই। এই কয়দিনে তোর...’
খলিল পুরো কথা শেষ করতে পারলেন না। আমির বাঁধা দিয়ে খুব বিরক্তি নিয়ে বললো,’তুই চুপ থাক। তোর ছেড়ারে বলবি,কাল বিছানা ছাড়তে। নয়তো ওর ইঞ্জিনে এমন আঘাত করব, সামনে না বিয়ে করাতে যাচ্ছো সেই বিয়ে ভেস্তে যাবে।’
‘আহ আমির! চাচাকে তুই-তুকারি করতে নিষেধ করেছি না অনেকবার? মানুষ শুনলে কী বলবে?’
‘মানুষের জন্যই ওরে চাচা ডাকি। আর তোমার জন্যই ও বেঁচে আছে। নয়তো ওর দেহ এতদিনে পঁচে মাটির সাথে মিশে যেত।’

খলিলের মুখটা অপমানে থমথমে হয়ে যায়। প্রতিদিন আমিরের অপমান, দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হচ্ছে। বিন্দুমাত্র সম্মান করে না। খলিল মজিদের পাশ থেকে দূরে গিয়ে বসেন। মজিদ মুখ দিয়ে ‘চ’ কারান্ত শব্দ করে বললেন,’কেন যে তোরা নিজেদের মধ্যে ভেজাল করিস। এতে তো আমাদের দলই দূর্বল হয়ে যাবে।’
আমির নির্বিকার কণ্ঠে বললো,’কাউকে লাগবে না। আমি একাই যথেষ্ট।’
‘বললেই তো হবে না। একা চলা যায় না।’
‘আরে যাও তো।’
আমিরের মেজাজ তুঙ্গে। মজিদ সময় নিয়ে বললেন,’এতো রেগে আছিস কেন?’
আমির চোখ বড় বড় করে তাকালো। তার চোখ দুটি লাল। ভয়ংকর রেগে আছে সে। মজিদ আর কথা বাড়ালেন না। নৌকা ছেড়ে দেয়া হয়। চোখের পলকে দূরে হারিয়ে যায় নৌকাটি। ট্রলারের ভেতর থেকে মন্তু বেরিয়ে আসে।

আমিরকে বলে,’ভাই,ছেড়িডারে সামলানি যায়তাছে না।’
‘যেভাবে সামলানো যায়,সেভাবে সামলা। চুলের মুঠি ধরে মা-বাপ তুলে গালি দিবি। মেয়েরা ছেলেদের মুখে নোংরা গালাগাল শুনলে দূর্বল হয়ে যায়। ভয় পায়। এ কথাটা কতবার বলব?’
মন্তু ভেতরে চলে যায়। আমির সিগারেটের ধোঁয়া শূন্যে উড়িয়ে ঘাটের উপরের ভিটায় তাকালো। একটা বোরকা পরা মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রখর দৃষ্টি মেয়েটিকে নিশানা করে। রাফেদ বাজার থেকে রঙ চা নিয়ে আসে। আমির রাফেদকে বললো,’ঘাটের মুখে মানুষ আছে?’
‘না স্যার। বাজারে এক দোকানদার আরেক দোকানদারের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রক্তারক্তি অবস্থা। সবাই ওখানে।’
আমির চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। কেউ নেই।

রাফেদকে বললো,’ওইযে মেয়েটিকে দেখছো? নিয়ে আসো।’
রাফেদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! এতো ঝুঁকি নিয়ে খোলা জায়গায় শিকার! সে ঢোক গিলে বললো,’কী বলেন স্যার! এভাবে...’
‘তো? সময় আছে হাতে? এখন ঝুঁকি নিতেই হবে। পারলে,মানুষের মাঝ থেকেও তুলে আনতে হবে। মন্তুরে নিয়ে যাও। কোনোরকম বিপদ ছাড়া মেয়েটিকে নিয়ে আসবে।’
‘স্যা..’
আমির জায়গা ছেড়ে দূরে চলে যায়। রাফেদের কথা সে শুনলো না। তার বার বার মনে হচ্ছে,পদ্মজাকে মায়া দেখিয়ে এভাবে ছেড়ে এসে সে ভুল করে ফেলেছে। কেন ভুল মনে হচ্ছে জানে না! পদ্মজা একবার খুন করেছে এছাড়া সে খুব সাহসী,বুদ্ধিমতী। সে চাইলে বুদ্ধি দিয়েও অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু

কী করবে? বের হতে তো কোনোভাবেই পারবে না। মেয়েগুলোর ঘরে ঢুকতে পারবে,কথা বলতে পারবে। এর বেশি কিছু না! তবুও মনটা কু গাইছে। ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে। সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে,'আমি কি কোনো বোকামি করে ফেললাম? ওদিকে সব ঠিক আছে তো!'

রাফেদ হা করে আমিরের যাওয়া দেখলো। তারপর একটা কাচের বোতল থেকে তরল কিছু ঢেলে নিল রুমালে। মন্তুকে নিয়ে ট্রলার থেকে নামলো। তাদের লক্ষ্য অপেক্ষারত কালো বোরকা পরা মেয়েটি।

চলবে...